যুগান্তর

JUL 17 2002

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় অবৈধ হস্তক্ষেপ ও আইন

'শিক্ষার আলো ছড়াবে যারা, আইন প্রণয়ন করবে যারা– তারাই যদি আইনের বিধানকে এভাবে উপেক্ষা করে চলেন তাহলে নিরীহ জনতার ঠাঁই হবে কোথায়!'

ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় সংসদ সদস্য, নেতা ও পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনার নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা ইদানিং স্বাভাবিক ঘটনায় পরিনত হয়েছে। প্রায় সব সরকারের আমলেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। আইনকে উপেক্ষা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব দখলের এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন পরে হলেও ধাক্কা খেয়েছে। হাইকোর্টের একটি রায়ের পর এধরণের পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষায় বিদ্যানুরাগীরা আশার আলো দেখতে পারছেন।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার প্রশ্নে যখন যে দল ক্ষমতায় যায়, সে দলই আইন ও বিধিকে উপেক্ষা করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবৈধ হস্তক্ষেপে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অপসারণ করা হয়। অপসারণের পর এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদে বসানো হয় কখনও স্থানীয় সংসদ সদস্য, কখনও তার প্রতিনিধি, অথবা স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের। এতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে। আত্মাবহ হতে বাধ্য হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সর্বক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠান কার্যত দুর্নীতিগ্রস্ত এবং জবাবদিহিতাহীন হয়ে পড়ে। আর সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার মানেও চরম অবনতি ঘটতে থাকে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৬১ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করা হয়। অধ্যাদেশটির ৩৯ ধারায় বিধি প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যথার্থভাবে বিধি প্রণয়ন ও তার প্রায়োগিক চর্চা আজও গড়ে ওঠেনি। ১৯৭৫ ও ১৯৭৭ সালে এ সংক্রান্ত একাধিক বিধিমালা প্রণীত হলেও বাস্তবে এর নিরপেক্ষ এবং আইনানুগ প্রয়োগ-অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি।

১৯৬১ সালের মূল আইনে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে (৩৯ ধারা অনুযায়ী) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডকে। অথচ এই সুনির্দিষ্ট বিধানকে উপেক্ষা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে খেয়ালখুশি মতো সার্কুলার জারি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত কমিটি বাতিল এবং তদস্থলে পছন্দমতো লোকদের বসিয়ে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে কোন আইন ও বিধি অনুসরণ করা হয় না। বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ক্ষমতাসীনদের বিরাগভাজন হতে রাজি নন। চাকরি হারানো, খারাপ স্থানে বদলি ইত্যাদি আতংক থেকে তারা মূল আইন ও বিধিপরিপন্থী জেনেও মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার ভিত্তিক বেআইনি আদেশ-নির্দেশ চালিয়ে যান। অথচ সার্কুলার কখনোই আইন নয়, ফলে আইনের উর্ধ্বে গিয়ে সার্কুলারকে ভিত্তি করে এসব বেআইনি কার্যক্রম চালানো হয়।

পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ থানার ফজিলা রহমান মহিলা কলেজকে ঘিরে এধরণের একটি ঘটনার সৃষ্টি হয়। এলাকার সমাজসেবী দানবীর আলহাজ আবদুর রহমান তার স্ত্রী ফজিলা রহমানের নমে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। যথাযথ বিধানানুসারে বরিশালের বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদনক্রমে পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক কলেজটির প্রতিষ্ঠাতার পুত্র আলহাজ শামীম হাসানকে সভাপতি মনোনয়নের প্রস্তাব পাঠালে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড তা অনুমোদন করে। অথচ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় সংসদ সদস্যের টেলিফোন এবং চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে শামীম হাসানকে অপসারণ করা হয়। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে তিনি এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে ৬৪৪/২০০২ নং রিট মামলা দায়ের করেন।

দীর্ঘ শুনানি শেষে হাইকোর্ট অপসারণ আদেশকে বেআইনি ও এখতিয়ার বহির্ভূত উল্লেখ করে গত ১৯ মে রায় দেন। রায়ে উল্লেখ করা হয়, *"এইরূপ আদেশ দেয়ার আইনগত কোন এখতিয়ার বোর্ড কর্তৃপক্ষের আদৌ ছিল না। ১৯৭৭ সালের এই সংক্রান্ত বিধিমালার ১১ ধারায় বলা হয়েছে যে, কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কমিটি বাতিল করা যেতে পারে, তবে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের ৩০ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হবে। বিধিবদ্ধ এই বিধান থাকা সত্ত্বেও কোনরূপ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই শামীম হাসানকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল, স্থানীয় সংসদ সদস্যের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। শিক্ষার আলো ছড়াবে যারা, আইন প্রণয়ন করবে যারা– তারাই যদি আইনের বিধানকে এভাবে উপেক্ষা করে চলেন তাহলে নিরীহ জনতার ঠাঁই হবে কোথায়!"*

শ. ম. রেজাউল করিম
অ্যাডভোকেট, সুপ্রিমকোর্ট